

সন্তান প্রতিপালনের নববি কর্মকৌশল

স্মার্ট প্যারেন্টিং উইথ

মুহাম্মাদ

ﷺ

মাসুদ শরীফ

স্মার্ট প্যারেন্টিং উইথ মুহাম্মাদ ﷺ
(শিশু প্রতিপালনের নববি কর্মকৌশল)

মাসুদ শরীফ



গার্ডিয়ান

পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ ﷺ আমাদের উসওয়াতুন হাসানা। সন্তান প্রতিপালনের নববি পদ্ধতি তাই মুসলিম পরিবার কাঠামোতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ প্রশিক্ষণ। স্মার্ট প্যারেন্টিং উইথ মুহাম্মাদ ﷺ গ্রন্থে আমরা সেই প্রশিক্ষণের দৃশ্যকল্প আঁকার একটা প্রয়াস নিয়েছি।

ভালো কিংবা খারাপ— দুটো অভ্যাসেরই বীজ বোপিত হয় শৈশবে। জীবন সফরের শুরুতেই গড়ে উঠা অভ্যাস বাকি জীবনের পুরোটা জুড়ে প্রভাবক হয়ে দাঁড়ায়। শিশু মননের ভেতরটাতে তাই শুরুতেই ঐকে দিতে হয় ভালো অভ্যাসের রাজটিকা। আমাদের মহানায়ক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তান প্রতিপালন নীতি ও পদ্ধতির অনুসরণের মধ্যেই সফল মুসলিম প্যারেন্টিং গাইড বিরাজমান।

নবিজি তাঁর অসাধারণ প্যারেন্টিং মেথডলজি দিয়ে এমন কতক শিশুকে বিপ্লবী হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন, যারা তামাম পৃথিবীকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। নবিজি তৈরি করেছিলেন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম-এর মতো যুগশ্রেষ্ঠ সব জ্ঞানবণিক। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানেই প্রস্তুত হয়েছিল হুসাইন (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.)-এর মতো আমৃত্যু লড়ে যাওয়া অনঢ় মনোবলসম্পন্ন তরুণ। গড়ে তুলেছিলেন এক আত্মবিশ্বাসী প্রজন্ম; যারা গোটা দুনিয়াতে সত্যের আলোকমশাল বয়ে নিয়েছিল।

জায়েদ বিন হারিসা (রা.), আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.), আলি বিন আবু তালিব (রা.)-এর মতো প্রজন্মই শত বাধা-বিপত্তি মাড়িয়ে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীকে ইসলামে অমিয় শান্তির সরাব পান করিয়েছিল। দিকে দিকে কালিমা তাইয়্যিবার বিজয়কেতন উড়িয়েছিল।

নবিজি কীভাবে তাদের নির্মাণ করেছিলেন? কীভাবে তাদের ভেতরটাকে পরিচর্যা করেছিলেন? এই গ্রন্থে আমরা সন্তান প্রতিপালনের নববি স্টাইল বুঝতে চেষ্টা করব।

জাহেলিয়াতেরে উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে হাবুডুবু খাওয়া আজকের পৃথিবীতেও যদি আমাদের সন্তানদের প্রত্যাশিত মঞ্জিলে পৌঁছাতে চাই, তাহলে অবশ্যই নবিজির প্রদর্শিত সুন্যাহর দিকেই নজর রাখতে হবে। তাহলে আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকেও বের হয়ে আসবে সাহাবায়ে কেরামের মতো যুগশ্রেষ্ঠ সব সোনালি মানুষ।

তরুণ প্রতিশ্রুতিশীল লেখক জনাব মাসুদ শরীফ ইতোমধ্যেই বাংলা সাহিত্যে তার মুন্সিয়ানার প্রমাণ দিয়েছেন। এই গ্রন্থে লেখকের সেই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকছে ইনশাআল্লাহ। গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স-এর পক্ষ থেকে সম্মানিত লেখকসহ বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পাঠকবৃন্দ সন্তান প্রতিপালনসংক্রান্ত নতুন কিছু এখানে খুঁজে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আগামী প্রজন্ম বিশ্বাসের পরশে পরিশুদ্ধ হয়ে বেড়ে উঠুক।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

বাংলাবাজার, ঢাকা

১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

সূচিপত্র



ভূমিকা	৯
শিশু-কিশোরদের চোখে নবিজি ﷺ	১৩
কিশোরদের চোখে নবি মুহাম্মাদ ﷺ	১৬
নবিজির মুখমণ্ডল	১৮
নবিজির চুল	১৯
নবিজির ব্যবহার	২২
নবিজিকে ঘিরে থাকা শিশু-কিশোররা	২৩
আবেগ-অনুভূতি	২৬
গর্ভে থাকা শিশুর প্রতি দয়া-মায়া	৩২
বাচ্চাদের চুমু খাওয়া	৩৫
বাচ্চাদের কোলে নেওয়া	৩৬
উপহার	৩৯
বাচ্চারা যখন ভুল করে	৪১
কন্যা	৪৩
আরেকটি মজার ঘটনা	৪৪
ঈমান বিকাশ	৪৭
নবির ভালো লাগা, আমার ভালোবাসা	৫২
সিরাহ রহস্য	৫৩
আল্লাহকে বিশ্বাস	৫৫
পরজীবনে বিশ্বাস	৫৭
তাকদির বা ভাগ্যলিপিতে বিশ্বাস	৫৮
কুরআনের প্রতি ভালোবাসা	৫৮
কুরআনের প্রতি কীভাবে ভালোবাসা বাড়াবেন	৬০
ঈমান গেঁথে দেওয়ার বটিকা	৬২
ইবাদত	৬৪
প্রশিক্ষণ	৬৬
সুখস্মৃতি	৬৮

পুরস্কার	৭২
ইবাদতে অভ্যস্ত করার বটিকা	৭৪
নীতিকথার পাঠ	৭৬
অসামান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	৭৮
দরদের অনুভূতি	৮০
বাবা-মায়ের সঙ্গে ভালো আচরণ	৮৩
পাশের বাড়ির মানুষজনের সঙ্গে ভদ্রতা	৮৫
মুসলিম পরিচয়	৮৬
সুন্দর আচার-আচরণ গড়ে তোলার টিপস	৮৮
শালীনতার পাঠ	৯০
শালীনতা শেখাতে নামাজ	৯২
দরজায় কড়া নাড়া	৯৩
আলাদা বিছানা	৯৪
ঘরের বাইরে	৯৫
সূরা নুর শেখান বাচ্চাকে	৯৭
সামাজিকতা	১০২
সালাম	১০২
দেখা-সাক্ষাৎ	১০৪
রাতে আত্মীয়দের বাসায়	১০৫
আত্মবিশ্বাস	১০৫
ভালো বন্ধু	১০৭
সুস্থ মানসিক বিকাশের বটিকা	১০৮
শেষ কথা	১১০

ভূমিকা

নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনী নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য সিরাত গ্রন্থ। একেক বইতে নবিজির ﷺ জীবনকে উপস্থাপন করা হয়েছে একেকভাবে। তবে এ বইতে আমি তাঁর জীবনের একটা ভিন্ন দিক উপস্থাপন করব। আমার জানা মতে, এর আগে কখনো এ বিষয়টি নিয়ে কোনো একক বই রচিত হয়নি। এ বইটিতে আমি বলব— নবি ﷺ কীভাবে সন্তানদের মানুষ করেছেন, তাদের সুস্থ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করেছেন, গড়ে তুলেছেন আগত প্রজন্মের দিশারি হিসেবে।

নবিজীবন নিয়ে কত যে বই রচিত হয়েছে, তার গুনার নেই। একেক বইতে নবিজির জীবনকে উপস্থাপন-বিশ্লেষণ করা হয়েছে একেকভাবে। তবে এ-বইতে তাঁর জীবনের এমন একটা দিক তুলে ধরব, যা আগে কখনো কোনো বইতে দেখা যায়নি।

বইটি মূলত লিখেছি ড. হিশাম আল-আওয়াদির *চিলড্রেন অ্যারাউন্ড দ্য প্রফেট* অবলম্বনে। বইটি পড়তে গিয়ে প্রিয়নবিকে এক নতুন চোখে দেখতে শুরু করেছিলাম। কত আঙ্গিক, কত ভূষণেই তো চিনি তাঁকে। কিন্তু নিজ হাতে তিনি কীভাবে সন্তান মানুষ করেছেন, তাদের সুস্থ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করেছেন, গড়ে তুলেছেন আগত প্রজন্মের দিশারি হিসেবে— সে আলোয় তো কখনো দেখিনি তাঁকে!

তো, পড়তেই পড়তেই মনে ইচ্ছে জেগেছিল বইটি নিয়ে কাজ করার। মূল বইটিতে লেখকের নজর ছিল পশ্চিমা সমাজে বেড়ে উঠা শিশু-কিশোররা। এর অনেক কিছু আমাদের জন্য খাটে, অনেক কিছু আবার খাটে না। তা ছাড়া আমার নিজস্ব কিছু চিন্তা-ভাবনাও ছিল কিছু বিষয়ে। সব মিলিয়ে তাই বইটি হুবহু অনুবাদ না করে মূলটা আয়নায় রেখে নিজের মতো করে আমাদের উপযোগী করে সাজিয়েছি।

শিশুদের মানুষ করা, তাদের প্রয়োজন মেটানো, খুব কঠিন একটা কাজ। জন্মের পর থেকেই শুরু হয় শিশুদের ‘মানুষ’ করার সংগ্রাম। নবি ﷺ কীভাবে শিশু-কিশোরদের মানুষ করেছেন, সেই শিক্ষা থেকে রসদ কুড়িয়ে আমরা বর্তমান সমাজে কাজে লাগাব। নবিজির সঙ্গে মিশেছেন, তাঁকে নিজের চোখে দেখেছেন, তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্যুতিতে দীপ্তিময় হয়ে পরবর্তী জীবনে যারা হয়ে উঠেছিলেন একেকজন আলোর মশাল— এমন বেশ কিছু কিশোর সাহাবিদের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে আমাদের।

প্রথম অধ্যায়ে আমাদের সাক্ষাৎ হবে নবিজির ﷺ সঙ্গে। তাঁর পরশে রঙিন হওয়া বেশ কয়েকজন শিশু-কিশোর সাহাবিদের সঙ্গেও পরিচয় হবে আমাদের। নবিজির দয়া, ভালোবাসা, মমতার মতো যে বিষয়গুলো কিশোর সাহাবিদের মনে প্রভাব ফেলেছিল, সেসব বিষয়ে কথা হবে এখানে।

ইসলামের গুরুত্ব দিকে মক্কা-মদিনায় বেড়ে উঠা নবীন সাহাবিদের পরিবার-পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়েও কিছু কথা হবে।

শিশু-কিশোরদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে আবেগ-ভালোবাসার গুরুত্ব অমূল্য। এখান থেকেই তৈরি হয় আধ্যাত্মিকতা এবং ঈমান রচনার ভিত। শিশুদের সঙ্গে মুহাম্মাদ ﷺ এক আদর-মমতামাখা সম্বন্ধ গড়েছিলেন। তাদের মাঝে পুরে দিয়েছিলেন আত্মবিশ্বাস। শিশু-কিশোরদের সঙ্গে তাঁর ছিল ভালোবাসার সম্পর্ক। এ জন্য তিনি যখনই যা বলতেন, তারা খুব আগ্রহভরে লুফে নিতেন। মনোযোগী শ্রোতা হয়ে হৃদয়ে গেঁথে নিতেন তাঁর কথামালা। অর্জিত শিক্ষা চর্চা করতেন মনপ্রাণ দিয়ে। ইসলামের শিক্ষা দেওয়ার বেলায় আমাদের বাবা-মায়েদেরও হতে হবে এমন। ভারী ভারী কথা আর ভাষণের চেয়ে সন্তানদের সঙ্গে আস্থা ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়লে ইসলাম চর্চা করানোর ব্যাপারে বাবা-মায়েদের তেমন বেগ পেতে হবে না— দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসব কথাই বলা হয়েছে।

শিশু-কিশোরদের মাঝে ঈমান গেঁথে দিতে আগে বাবা-মায়েদের ইসলামের ধারক-বাহক হতে হবে। তাদের নিজেদের কথায় ও কাজে থাকতে হবে ইসলামের প্রতিচ্ছবি। তৃতীয় অধ্যায়ে নবিজির দয়া-মায়া ও ভালোবাসাবিষয়ক বেশ কিছু হাদিসের উল্লেখ করেছি। ইসলামের সঙ্গে সন্তানের নিবিড় বাঁধন গড়তে এগুলো কাজে লাগবে।

নবিজি শিশু-কিশোরদের কীভাবে আল্লাহর ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করতেন, তা নিয়ে কথা হবে চতুর্থ অধ্যায়ে। ইবাদতে অভ্যস্ত করার ব্যাপারে অভিভাবক ও সন্তান উভয়কেই ধৈর্য ধারণ ধরতে হবে। কাজটা করতে হবে ধাপে ধাপে। আর মূল দৃষ্টি থাকবে দৈনিক পাঁচবার নামাজের বিষয়ে। ইবাদতের বেশ কিছু ধরন শিশু, এমনকী কিশোরদের জন্যও বাধ্যতামূলক নয়। তাই সেসব ইবাদত তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করতে হবে আল্লাহর উপাসনার সঙ্গে একটা আত্মিক বন্ধন গড়ে তুলতে। নবি মুহাম্মাদ ﷺ সেই কাজটি কীভাবে করেছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ থাকবে এখানে।

শিশু-কিশোরদের মাঝে নৈতিকতার পাঠ অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাজটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আজকের দুনিয়ায় এটা রপ্ত করাও বেশ তেমন। নবি মুহাম্মাদ ﷺ কীভাবে সে কাজটি আঞ্জাম দিতেন, তা-ই বলব পঞ্চম অধ্যায়ে।

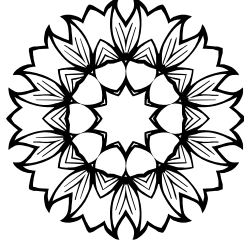
শিশু-কিশোরদের মাঝে ঈমান গেঁড়ে দেওয়া গেলে, আল্লাহর ইবাদত চর্চায় অভ্যস্ত করা গেলে, স্বাভাবিকভাবেই তাদের মাঝে নীতি-নৈতিকতা গড়ে উঠবে। ওয়াজ-মাহফিল, লেকচার-বক্তৃতা করে বাচ্চাদের মাঝে মূল্যবোধ গড়ে তোলা যায় না। বাবা-মা আচার-আচরণের মাধ্যমে যত কার্যকরভাবে শিশুদের মাঝে এই বোধ গড়ে তুলতে পারবে, তা আর অন্য কোনোভাবেই সম্ভব নয়; এটাই ছিল নবিজির শিক্ষা।

যৌনতা বা শারীরিক আকর্ষণের বিষয়ে শিশু-কিশোরদের সঙ্গে কথা বলাটা আমাদের সমাজে যেন অঘোষিত ‘পাপ’। অথচ নবিজির সুন্নাহ তো বটেই; কুরআনের মাঝেও রয়েছে এ সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা।

বাড়ন্ত বয়সে এ বিষয়গুলো তাদের মাঝে খোলাসা না করলে নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণের গ্রাসে পরিণত হয় তারা। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমি তাই দেখাব, নবি মুহাম্মাদ ﷺ কীভাবে শিশু-কিশোরদের সঙ্গে এসব বিষয় সামাল দিয়েছেন, তাদের শারীরিক আকর্ষণকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। যৌনতা বর্তমান সময়ে ঢুকে পড়েছে ঘরের কোণে কোণে। তাই সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই বাবা-মা এসব বিষয়ে উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়েন। এসব বিষয়ে তারা কীভাবে শিশু-কিশোরদের মার্জিত করবেন, এ অধ্যায়ে সেসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হবে।

সপ্তম অধ্যায়ে কথা বলব সামাজিকতা নিয়ে। মানুষ সামাজিক জীব। প্রাচীনকাল থেকে এভাবেই তাদের বসবাস। এভাবেই তাদের বিকাশ। কিন্তু বর্তমান সময়ে সবাই যেন কেমন নিজের কুঁড়েঘরে বন্দি থাকে। অনেকের সঙ্গে শিশু-কিশোররা সহজে মিশতে পারে না। স্কুল-কলেজ পেরিয়ে জীবনের বাস্তব মঞ্চে নিজেকে মেলে ধরতে হিমশিম খায়; সমাজের কার্যকর অংশ হতে পারে না। নিজেদের মুসলিম পরিচয় নিয়ে ভোগে হীনম্মন্যতায়। এ অধ্যায়ে দেখব, নবি মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর অনুপম আদর্শের মাধ্যমে এক আত্মনির্ভরশীল সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন মুসলিম হিসেবে গর্বিত এক প্রজন্মধারা। বাসাবাড়িতে বাবা-মায়ের প্রচেষ্টা যেন নস্যাৎ হয়ে না যায়, এ অধ্যায়ে থাকবে তার টোটকা।

চলুন, তাহলে শুরু করি...



শিশু-কিশোরদের চোখে নবিজি ﷺ

যদি এক শব্দে শিশু-কিশোরদের সঙ্গে নবিজির আচার-ব্যবহার তুলে ধরতে চাই, তাহলে সেই শব্দটা হবে ‘দরদ’। তরুণ সাহাবি আনাস (রা.) বলছেন—

‘আমি শিশুদের প্রতি নবিজির চেয়ে বেশি দরদি আর কাউকে দেখিনি।’

নারী ও শিশুদের তিনি কখনোই শারীরিক শাস্তি দেননি। বাবা-মায়ের ভুলের জন্য কখনো কোনো সন্তানকে দোষারোপ করেননি। অথচ তখনকার সমাজব্যবস্থা এমন ছিল, একজনের ভুলের জন্য গোটা পরিবার বা গোত্রকেই দায়ী করা হতো।

শুধু কি মুসলিম শিশু? অমুসলিম, এমনকী বিয়ে-বহির্ভূত সম্পর্কের কারণে জন্ম নেওয়া শিশুদের প্রতিও ছিল তাঁর অপারিসীম দরদ। একবার এ রকম অবৈধ গর্ভধারণকারী এক নারী নবিজির কাছে এলেন নিজের দোষ স্বীকার করে ইসলামের শাস্তি মাথা পেতে নিতে। কিন্তু শাস্তি প্রয়োগ না করে নবিজি বললেন— ‘ফিরে যাও, বুকের দুধ না ছাড়া পর্যন্ত বাচ্চাকে দুধ পান করাও।’

একবার এক ইহুদি শিশুর আরোগ্য কামনায় নবিজি তাকে দেখতে গিয়েছিলেন।

আরেকবার কী হলো— এক নারীর বাচ্চা আল্লাহর রাসূলের কোলে। হঠাৎ বাচ্চাটা তাঁর কাপড়ে প্রস্রাব করে দিলো। এতে নবিজি মোটেও রাগ করলেন না, বিরক্তও হলেন না। শুধু কাপড়ের ওপর কিছু পানির ছিটা দিলেন। এটাই ছিল শিশুদের প্রতি নবিজির আচরণ।

বাচ্চাদের যে অপারিসীম ভালোবাসা প্রয়োজন, এটা তিনি খুব ভালোভাবেই বুঝতেন। জানতেন— শিশুরাও অন্যের কদর চায়, সম্মান চায়; নিগৃহীত, অবহেলিত হতে চায় না। আনাস (রা.) বলেছেন—

‘একবার আমি বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিলাম। তখন পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নবিজি ﷺ আমাদের সালাম দিলেন।’

আমাদের নবিজি ﷺ মাঝেমাঝে শিশু-কিশোরদের সঙ্গে হালকা রসিকতাও করতেন। মাহমুদ বিন রাবিয়া বলছেন—

‘আমার বয়স তখন পাঁচ বছর। মনে আছে, নবিজি ﷺ একবার বালতি থেকে মুখে পানি নিয়ে মজা করে আমার মুখে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন।’

ভালো লাগার বা আনন্দের স্মৃতিগুলো বাচ্চারা কখনো ভোলে না। নবিজি জানতেন, শিশুরা চমক পছন্দ করে, উপহার পেতে ভালোবাসে। তারা মিষ্টি জাতীয় খাবার, কাপড়চোপড় ইত্যাদি জিনিস খুব পছন্দ করে। তাই মৌসুমের প্রথম ফল পাকলে যখন তাঁর কাছে নিয়ে আসা হতো, তখন তিনি প্রথমে সেগুলোর প্রাচুর্যের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতেন। এরপর আশেপাশের কচি-কাঁচাদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। তিনি উপহারগুলো সব সময় সশরীরেই দিতেন। কারণ, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরিতে উপহারের চেয়ে সশরীরে উপস্থিতি বেশি কার্যকর।

শিশু-কিশোরদের মাঝে দায়িত্ববোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ গড়ে তোলার জন্য মাঝে মাঝে তিনি তাদের বিশেষ কিছু কাজ করতে দিতেন। কেউ একজন তাদের ওপর আস্থা রাখছে, এটা শিশু-কিশোররা খুব পছন্দ করে। এটা তাদের দায়িত্ববোধ বাড়িয়ে দেয়। একবার কিশোর বয়সে আনাস (রা.)-কে এমন একটি কাজ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যে মায়ের কাছে ফিরতে ফিরতে তার দেরি হয়ে যায়। মা জিজ্ঞেস করলেন— ‘কী ব্যাপার? দেরি হলো কেন?’

আনাস বললেন— ‘নবিজি আমাকে একটা কাজে পাঠিয়েছিলেন।’

‘কী কাজ?’

‘বলা যাবে না, গোপনীয়।’

চিন্তা করা যায়, রাসূলের আস্থা তাকে অতটুকু বয়সে কতটা দায়িত্ববান করেছিল!

কাজবাজ করতে গিয়ে বড়ো বড়ো মানুষদেরই কত ভুল হয়। সেখানে শিশু-কিশোরদের ভুল হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক বিষয়। নবিজির সময়ের শিশুরাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তাদেরও ভুল হতো, তাদেরও মনে করিয়ে দিতে হতো, বাজে আচরণ শুধরে দিতে হতো।

একবার এক ছেলে খেজুর গাছে পাথর ছুড়ছিল। ছেলেটিকে নবিজির কাছে আনা হলো। নবি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন—

‘কীরে বাবা, খেজুর গাছে পাথর ছুড়ছ কেন?’

‘খেজুর খেতে।’

‘শোনো, এভাবে গাছে পাথর ছুড়তে হয় না। নিচে যেগুলো পড়ে থাকবে, সেখান থেকে খাবে।’

এরপর তিনি ছেলেটির মাথায় চাপড় মেরে দুআ করে বললেন—

‘আল্লাহ তোমাকে পর্যাপ্ত খাওয়ার তাওফিক দান করুন।’

মুহাম্মাদ ﷺ-এর সততার বিষয়টি নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। তিনি শুধু নিজের ব্যাপারেই সৎ ছিলেন না; অন্যদেরও এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতেন। এমনকী বাচ্চাকাচ্চাদের যেন বাবা-মা ধোঁকা না দেয়, মিথ্যে না বলে, সে বিষয়েও খেয়াল রাখতেন।

একবার বন্ধুদের সঙ্গে এক ছেলে খেলছিল। তার মা এসে কিছু একটা দেওয়ার লোভ দেখিয়ে তাকে ডাকতে লাগলেন। বিষয়টা নবিজির চোখে পড়ল। মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন— ‘ওকে কী দেবেন?’

‘এই তো কিছু খেজুর আর কী।’

‘যদি না দেন, তাহলে কিন্তু তা আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা হিসেবে গোনাহ লেখা হবে।’ বললেন রাসূল ﷺ।

তিনি সত্যবাদিতার বিষয়টি ছেলেটিকে সরাসরি বললেন না বটে, কিন্তু পাশ থেকে সে ঠিকই শুনে নিল। তাই বড়ো হয়ে সে অন্যদের এই ঘটনা জানাতে ভোলেনি। এভাবে বাচ্চাদের সঙ্গে মজা করার সময়ও নবিজি কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেননি।

কিশোরদের চোখে নবি মুহাম্মাদ ﷺ

নবিজিকে সাধারণত আমরা বয়স্কদের চোখে দেখে অভ্যস্ত। সিরাত গ্রন্থগুলোতে তাঁকে একজন আদর্শ পুরুষ, নেতা, স্বামী ইত্যাদি বিভিন্ন ভূমিকায় দেখে থাকি। তবে একজন শিশু বা কিশোরের চোখে তিনি কেমন ছিলেন, এ বিষয়টা খুব একটা পাওয়া যায় না।

আমরা জানি, তিনি ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন। এরপর মক্কায় কাটিয়েছেন ১০ বছর। বাকি ১৩টি বছর কাটিয়েছেন মদিনায়। আমরা যখন কিশোরদের চোখে নবিজিকে দেখব, তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ ও ৫০-এর কোঠায়। মাদানি জীবনের শেষের দিকে তো সেটা একেবারে ৬০-এর কোঠায়। আল্লাহর রাসূলের বয়সের বিষয়টা মাথায় রাখলে শিশু-কিশোরদের সঙ্গে তাঁর আচার-আচরণের ঘটনাগুলো সহজেই মনের চোখে দেখা সম্ভব হবে।

প্রথমেই দেখি, শিশু-কিশোরদের চোখে তাঁর মুখখানি কেমন দেখাত।

জন্মের কয়েকদিনের মধ্যেই একটি শিশু পরিচিত মুখ দেখে হাসে, আবার কারও কারও চেহারা দেখে ভয়ে কান্না করে। যার চেহারা দেখে ভালো লাগে, তার মুখ দেখে বাচ্চারা হাসে, আনন্দ পায়।

২০০৪ সালের এক গবেষণায় একটি মজার তথ্য উঠে এসেছে। এক্সেটর ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক অ্যালান স্ল্যাটারও তার সহকর্মীরা শিশুদের নিয়ে একটি গবেষণা চালিয়েছিলেন। সে গবেষণায় মাত্র একদিনের শিশুও ছিল।

এসব বাচ্চাদের তারা জোড়ায় জোড়ায় বেশ কিছু ছবি দেখালেন। খেয়াল করলেন, দুটো ছবির মধ্যে যে চেহারাটি বেশি আকর্ষণীয়, বাচ্চারা সেটিতেই দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে আছে। তার মানে, সুন্দর-আকর্ষণীয় মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার বিষয়টি জন্মগত; আশপাশ থেকে শিখেছে— বিষয়টা এমন নয়। তো বিষয়টা যদি বাচ্চাদের ক্ষেত্রেই এমন হয়, তাহলে শিশু-কিশোরদের বেলায় এর প্রভাব আরও বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক।

নবি মুহাম্মাদ ﷺ বেশ সুদর্শন ছিলেন, তাই শিশু-কিশোররা তাঁকে দেখে কখনোই ভয় পেত না। একটি হাদিসে তাঁকে ‘সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষ’ বলেছেন একজন সাহাবি। অন্য হাদিসে আরেকজন বলছেন—

‘আমি নবিজির চেয়ে সুদর্শন কাউকে কখনো দেখিনি। তাঁর চেহারায় যেন সূর্যের ঝিলিক খেলা করে।’

তখন তো ছবি তোলার যুগ ছিল না। মানুষের ছবি আঁকাও হতো না। ইসলাম-প্রচারের কারণে নবিজির নাম অনেকেই জানতেন, কিন্তু কখনো চোখে দেখা হয়নি। তো এমন একজন মানুষ একবার সাহাবি বারা বিন আজিবের কাছে জানতে চাইলেন, নবিজি দেখতে কেমন ছিলেন। তিনি বললেন—

‘নবিজির চেহারা কি তরবারির মতো?’

বিন আজিব বললেন— ‘না, চাঁদের মতো।’

মজার বিষয় হলো— আরব সংস্কৃতিতে তরবারি ও চাঁদ দুটোই সৌন্দর্যের প্রতীক, কিন্তু অর্থের ভাবের দিক থেকে দুটোর মধ্যে চমৎকার পার্থক্য রয়েছে।

সূর্যের আলোর ঝিলিক খেলা মুখ কিংবা চাঁদের মতো কোমল চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকলে একটা বাচ্চার কেমন অনুভূতি হবে? সেই বাচ্চাই যদি আবার সুন্দর ধারাল তরবারি বা অন্য কোনো অস্ত্রের দিকে তাকায়, তখন অনুভূতি কেমন হবে? দুটো অনুভূতিই কি এক হবে? মোটেও না। এ জন্য নবিজির চেহারাকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করেছেন সাহাবি; তরবারির সঙ্গে নয়। তাঁর চেহারা দেখলে মনে শ্রদ্ধা জাগত; আতঙ্ক নয়। চোখ যেন শান্তি খুঁজে পেত। কোনো কোনো ঘটনায় দেখা যায়— তিনি যদি নীরবও থাকতেন, তবুও তাঁর মুখভঙ্গি বিভূতি ছড়াত, তাঁকে দেখে মনে সম্মম জাগত।

নবিজি যখন দেশান্তর হয়ে মদিনায় এসেছেন। অনেকেই দেখতে আসছেন তাঁকে। কৌতূহলবশে এক ইহুদি পণ্ডিতও এসেছেন। বহুদিন পরে তিনি সেই ঘটনার কথা এভাবে বলেছিলেন—

‘লোকদের সঙ্গে আমিও তাঁকে দেখতে গেলাম। তাঁর চেহারা দেখেই বুঝলাম, এই চেহারা কোনো মিথ্যাবাদীর হতে পারে না।’

লোকটি কিন্তু তখনও অমুসলিম! তার ওপর ভিন্ন ধর্মের পণ্ডিত! কেবল একবার নবিজির দিকে তাকাতেই তিনি যে অনুভূতিতে দ্রবীভূত হয়েছিলেন, তাতে নিশ্চিত হয়েছিলেন— কোনো ভণ্ড কিংবা অপরাধীর চেহারা এমন দীপ্তিবান হতে পারে না।

‘পরে আমি তাঁকে বিশ্বাস করি।’

এই ইহুদি পণ্ডিত ছিলেন— আব্দুল্লাহ বিন সালাম; যিনি ওই এক ঝলকের আবেশেই ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হন।

নবিজিকে দেখে যদি বড়ো কোনো মানুষের এমন অনুভূতি হয়, তাহলে ছোটোদের কেমন লাগত, ভাবুন দেখি!

নবিজির মুখমণ্ডল

কথা বলার সময় মানুষের ঠোঁট, চোখ সবচেয়ে বেশি নড়ে। তাই কারও সঙ্গে কথা বলার সময় ছোটোদের চোখ সেদিকেই থাকে। আসুন তবে দেখি, ছোটোদের চোখে কেমন ছিল নবিজির মুখমণ্ডল।

যাদের ঘুম কম হয়, সাধারণত তাদের চোখ লালচে থাকে, কিন্তু নবিজির চোখ মোটেও তেমন ছিল না। তাঁর চোখের গোলক আর মণির মাঝে ছিল পাতলা অথচ স্পষ্ট বিভাজন রেখা। চোখের তারা ছিল ঘন কালো। দৃষ্টিনন্দন লালভ সাদা অংশ দিয়ে ঘেরা। আল্লাহ তাঁকে অসম্ভব সুন্দর দুটো চোখ উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর চোখজোড়া ছিল— বাংলায় বললে অনেকটা পটোলচোরা। চোখের পাঁপড়ি ছিল লম্বা। ভ্রু ছিল ঘন, দিঘল ও আলাদা।

তাঁর মুখাবয়ব ছিল পরিমিত পরিমাণে প্রশস্ত। দাঁতগুলো উঁচু-নিচু ছিল না। দুই দাঁতের মাঝে অসম ফাঁক ছিল না; দাঁত ছিল উজ্জ্বল।

কোনো কোনো বিবরণ শুনলে মনে হতে পারে, সারাদিন বুঝি তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত বা গম্ভীর হয়ে থাকতেন, কিন্তু একজন বলছেন—

‘আল্লাহর রাসূলের চেয়ে আর কাউকে বেশি হাস্যোজ্জ্বল দেখিনি।’

আব্দুল্লাহ বিন হারিস বলেছেন— ‘আমার সঙ্গে যখনই নবিজির দেখা হতো, তিনি হাসিমুখে থাকতেন।’

মুখ পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন নবি মুহাম্মাদ ﷺ। আরাক গাছের ডাল দিয়ে বানানো মিসওয়াক বা মাজন দিয়ে তিনি নিয়মিত দাঁত মাজতেন। প্রাচীন সময় থেকেই ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের কাছে এটি প্রিয়। এখন তো একে অর্গানিক বা প্রাকৃতিক পণ্য মনে করা হয়।

নবিজি কথা বলতেন স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ উচ্চারণে। কথা বলার সময় তাড়াহুড়ো করতেন না। ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা করে বলতেন। মা আয়েশা (রা.) তাঁর কথা বলার এই বিশেষ ভঙ্গি প্রসঙ্গে বলেছেন—

‘তোমরা যেমন এখন তড়িঘড়ি করে কথা বলো, নবি সেভাবে কথা বলতেন না। তিনি কথা বলতেন স্পষ্টভাবে, শুদ্ধভাবে। তাঁর সঙ্গে বসা প্রত্যেকেই তাঁর প্রতিটি কথা মনে রাখতে পারতেন।’

নবিজির সঙ্গে থাকা লোকজন ছিলেন অনেকটা অডিও-রেকর্ডারের মতো। কান খাঁড়া করে শুনতেন তাঁর প্রতিটি শব্দ। তিনিও সুন্দর করে, আস্তে-ধীরে ভেবেচিন্তে শব্দ চয়ন করতেন। তাঁর কথাগুলো আত্মস্থ করতে শ্রোতাদের সময় দিতেন। কোনো কোনো কথার গুরুত্ব বোঝাতে কখনো কখনো তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যেন কোনোভাবেই কেউ ভুলে না যায়।

সাহাবিদের সদুপদেশ দেওয়ার বেলায় তাদের মন-মেজাজ ও চরিত্রকে বিবেচনায় রাখতেন। এ জন্য দেখা যায়, তিনি একই প্রশ্নের জবাবে একেকজনকে একেক উপদেশ দিচ্ছেন। যেমন : কাউকে হয়তো বলছেন, তোমার মেজাজ ঠান্ডা রাখো। আবার কাউকে বলছেন, পরিণাম ভেবে কাজ করো। কারণ, প্রথমজন হয়তো বিরূপ পরিস্থিতিতে মেজাজ ঠান্ডা রাখতে পারে না। এ জন্য তাকে এই উপদেশ দিয়েছেন। আবার দ্বিতীয়জনের সমস্যা ভিন্ন, তাই তাকে দিয়েছেন ভিন্ন পরামর্শ। এ জন্য সিরাত বা নবিজির জীবনী নিয়ে পড়াশোনার বেলায় পরিবেশ-পরিস্থিতি, ঘটনার কালানুক্রম বোঝা জরুরি। কিন্তু দেখা যায়—অনেকেই মুখস্থ সিরাত পড়েন বা বর্ণনা করেন, যে কারণে এ সম্বন্ধে তাদের বুঝ হয় ভাসাভাসা ও একমুখী।

নবিজি দৈহিক অবয়ব এত বিস্তারিতভাবে সংরক্ষিত যে, তাঁর বুকের লোম কেমন ছিল, তা-ও জানা যায়। প্রথম দর্শনে একজন মানুষের মাথার চুলও আমাদের নজর কাড়ে। চলুন দেখি, কেমন ছিল তাঁর চুল...

নবিজির চুল

কেউ একজন শিশু নবিজির দিকে তাকালে দেখত—সুন্দর, পরিপাটি নিকশ কালো চুল। তাঁর চুল কোঁকড়ানো ছিল না, ভাঙাও ছিল না। সামান্য বাঁকানো ছিল। কখনো কখনো তা কান পেরিয়ে কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছাত।

একজন ষাটোর্ধ্ব মানুষ হিসেবে তাঁর সাদা চুলের সংখ্যাও ছিল নেহায়েত কম; মাত্র ২০টি। চিন্তা করতে পারেন, ঐতিহাসিকরা কী বিস্তারিতভাবে তাঁর জীবনকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন! আল্লাহর রাসূলের কত খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে নজর ছিল তাদের!

মদিনায় তিনি ছিলেন গোটা মুসলিম ভূখণ্ডের নেতা। তাঁর স্ত্রী ছিলেন একাধিক। যেকোনো প্রয়োজনে সাহাবিরা ছুটে আসতেন তাঁর কাছে। এত সব দায়িত্ব থাকার পরও তাঁর পাকা চুল ছিল মাত্র

২০টি! এই বিশটি চুল পাকার জন্য পারিবারিক কলহ বা আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি দায়ী করেননি; বরং কুরআন মুখস্থ রাখার ভাবনায় এমনটি হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

আচ্ছা, পাকা চুল নিয়ে এত কথা কেন?

কারণ আছে। শিশু-কিশোরদের কাছে নবিজি কোনো বৃদ্ধ নানা-দাদা ছিলেন না; বরং তাকে মনে হতো একজন সুঠাম মধ্যবয়স্ক। প্রয়োজনে তাকে মন খুলে দুটো কথা বলা যায়। বাচ্চাদের সঙ্গে তিনি হাসতেন, খেলতেন, মজা করতেন। তাই বলে তিনি তাদের চোখে হাসি-তামাশার পাত্রও ছিলেন না। ছেলে-বুড়ো সবাই তাকে সম্মান করত। শিশু-কিশোররা যেন তাকে বাবার মতো দেখত। এ কারণেই তিনি শিশুদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন অতি আপন।

ধরুন, আপনার পাশের বাসায় মুহাম্মাদ নামে একজন লোক থাকেন। তাকে দেখলে কেমন যেন আপন আপন মনে হয়। হাস্যোজ্জ্বল, প্রাণবন্ত এক মানুষ। দেখলেই মনটা জুড়িয়ে যায়। তার চেহারায় কোনো পক্ষিলতার ছাপ নেই। লোকটা সবার প্রতি সদয়। মানুষের প্রয়োজন পূরণে নিবেদিত প্রাণ। এমন মানুষের কথা শুনলে না দেখেই কি তার প্রতি অদৃশ্য এক ভালোলাগা তৈরি হবে না?

তাহলে এমন একজন মানুষের সরাসরি তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায় যখন কোনো শিশু বেড়ে উঠে, বড়ো হয়ে যুবক বয়সে নিজের কাঁধে জোয়াল তুলে নেয় এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তার গল্প করে, তখন তাদের মাঝে কি বিশাল উৎসাহ কাজ করে, ভাবতে পারেন?

কিশোর বয়সে আনাস বিন মালিক নবিজির খুটফরমাশ খেটেছেন টানা ১০ বছর। নবিজির মৃত্যুর পরও তিনি প্রায় ৮০ বছর বেঁচে ছিলেন। অন্যান্য অনেক সাহাবির চেয়ে তিনি অনেক বেশি বছর আয়ু পেয়েছিলেন; প্রায় ১০৩ বছর। নবিজির স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন—

‘নবির মৃত্যুর পর প্রতি রাতেই আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখেছি। যতবার তাঁর মুখখানি মনে পড়েছে, কান্না ধরে রাখতে পারিনি।’

চিন্তা করতে পারেন! এত বছর পর আনাস (রা.) নিজেই অতিবৃদ্ধ অথচ নবিজির স্মৃতি তখনও তাঁর চোখে জ্বলজ্বল করছে, যেন নিজের চোখের সামনে নবিজিকে দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি।

নবিজির জীবনীগ্রন্থ পড়ার সময় তাঁর শারীরিক নানা দিক সম্বন্ধে জানি বটে। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখি, সেগুলোর কি প্রভাব ছিল তাঁর আশেপাশের মানুষগুলোর মাঝে?

সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ অনেকেই দেখে থাকবেন, টিভিতে বা ছবিতে। সব সময় সামনে থেকে দেখতে দেখতে কখনো যদি ওটাকে পাশ থেকে বা পেছন থেকে দেখেন, একেবারেই অন্যরকম দেখাবে। হয়তো ভাববেন, এটাই স্মৃতিসৌধ কি না!

নবিজির জীবনকে সাধারণত আমরা একটি দিক থেকে দেখে অভ্যস্ত। একজন নারীর চোখে নবিজি কেমন ছিলেন, তা কি দেখার চেষ্টা করেছি কখনো? কিংবা একজন সদ্য তরুণের চোখে? কিশোর বা শিশুর চোখে? যত ভিন্নভাবে তাকে দেখার চেষ্টা করবেন, তাঁর সম্বন্ধে তত ভিন্ন ভিন্ন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি জেগে উঠবে। ইমাম তিরমিজি, ইমাম বুখারি, ইমাম ইবনে কাসিরের রচিত নবিজির জীবনী বারবার পড়ুন। প্রতিবারই ভিন্ন এক অবয়বে হাজির পাবেন নবিজিকে।

প্রথম দেখায় একজন কিশোর বা শিশুর সামনে তিনি কেমন, তা বললাম। এখন ভাবুন তো, এরকম একজন মানুষ যদি এসে আপনার হাত দুটি ধরেন, মুখে হাত বুলিয়ে দেন, তারপর আপনাকে কিছু বলেন— বলুন তো তবে কখনোই কি তাঁর কথা ভুলতে পারবেন? একজন মানুষ আপনাকে বকাবকি করেন না, চিৎকার-চোঁচামেচি করেন না, আপনার প্রতি তেড়ে আসেন না, তাকে দেখলে ভয়ে সিঁটিয়ে যান না— এমন মানুষকে আপনি ভালো না বেসে পারবেন? ঠিক এমনই ছিলেন নবিজি। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হিসেবে আপনার কাছে যদি তাকে এমন হাসিখুশি, প্রাণবন্ত মনে হয়, তাহলে একটা বাচ্চার কাছে কেমন লাগবে ভাবুন তো!

নবিজির ব্যবহার

মনে করুন, আপনি কোথাও একটা জনকল্যাণমূলক কাজে গিয়েছেন, কিন্তু গিয়ে বিরূপ পরিস্থিতির মুখে পড়লেন। স্থানীয়রা আপনার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে লাঠিসোটা, ইটপাটকেল নিয়ে এগিয়ে এলো। এলোপাথারি মেরে আপনাকে এলাকাছাড়া করল। আপনার গায়ের বিভিন্ন জায়গা কেটে দরদর করে রক্ত পড়ছে; যন্ত্রণায় টেকা দায়। থানার ওসি আপনাকে ভালো জানেন। খবর পেয়ে ছুটে এলেন আপনার সহায়তার জন্য। বললেন—

‘ভাই, বলেন তো এলাকাসীরা ওপর অ্যাকশন নিই।’

সবাইকে অবাক করে দিয়ে আপনি বললেন— ‘দরকার নেই ভাই। হয়তো এদের পরের প্রজন্ম আমার কথা বুঝবে।’

বাস্তব মনে হচ্ছে না, তাই না? আমার মনে হয় না, কোনো মানুষের পক্ষে বিরোধীদের প্রতি এত দরদি ও নিঃস্বার্থ হওয়া সম্ভব। অথচ, আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ ﷺ এমনটিই করেছিলেন।

কথায় কথায় মা আয়েশা (রা.) একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, উহুদের লড়াইয়ের দিনের চেয়ে জীবনে আর কোনো বিভীষিকাময় দিন এসেছিল কি না?

আপনারা অনেকেই জানেন, নবিজির আদেশ না মানায় সেদিন লড়াইতে জয়ী হতে হতেও খুবই মর্মান্তিক অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল মুসলিম বাহিনী। তাঁর শিরোস্ত্রাণ ভেঙে গিয়ে রক্তে জবজবে হয়ে গিয়েছিল মুখ। ভেঙে গিয়েছিল সামনের পাটির দাঁত; এমনকী দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে বসে পড়েছিলেন তিনি। মুহাম্মাদ ﷺ মারা গিয়েছেন বলে একটা গুজবও ছড়িয়ে পড়েছিল। এ জন্য

স্বভাবতই আয়েশা (রা.)-এর কাছে মনে হয়েছিল, এটাই বুঝি তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিনতম দিন। কিন্তু কী আশ্চর্য! নবিজি জানালেন, এর চেয়েও কঠিন দিন তাঁর জীবনে এসেছিল।

সেদিন তায়েফে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তিনি যে অসহায় পরিস্থিতির মুখে পড়েছিলেন, সেটাই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে সংকটময় দিন। পরিস্থিতি সেদিন এতটাই ভয়ানক ছিল যে, ফেরেশতারাও ফুঁসে উঠেছিলেন। আল্লাহর হুকুমে জিবরাইল (আ.) পাহাড়ের ফেরেশতাদের নিয়ে এসে বলেছিলেন- ‘আপনি শুধু হুকুম করুন, দুই পাহাড়ের মাঝে পিষে ফেলি এই নরাধমদের। কিন্তু মর্ত্যের মানুষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ বললেন- ‘ছেড়ে দাও; এরা বোঝেনি, হয়তো এদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ঠিকই বুঝবে।’

কোনো প্রতিশোধের লালসা নেই, অহংবোধ নেই। মানুষগুলো প্রাপ্য শাস্তি পাক- এটাও তাঁর ইচ্ছায় নেই। তাঁর কাঁধে যে অনেক বড়ো দায়িত্ব। এখন অনেক বড়ো বড়ো বিষয়গুলোও তাঁর কাছে তুচ্ছ। তিনি তো কোনো রাজনৈতিক যুদ্ধে নামেননি যে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে পারলেই তৃপ্ত। রোমা মেরে নিরস্ত্র মানুষদের উড়িয়ে দেওয়ার রোমাঞ্চকর মিশনেও তিনি নামেননি। তাঁর চাওয়া কেবল একটাই- পৃথিবীর সব মানুষ আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করুক। তাঁকে মেনে নিয়ে জান্নাতে নিজেদের নিবাস গড়ে নিক। এমন মহতি মিশনের জন্য চাই সুশিক্ষা, সহিষ্ণুতা, দয়া।

আরেকটি ঘটনা বলি। অনেকেই জানেন, নবিজি নামাজে কী পরিমাণ শাস্তি পেতেন। আপন মানুষের সঙ্গে সময় ভুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে আমরা যে শাস্তি পাই, নামাজে তার চেয়েও অনেক বেশি তৃপ্তি পেতেন তিনি। সেই নামাজে দাঁড়িয়ে যদি তিনি শুনতেন- আশেপাশে কোনো বাচ্চা কাঁদছে, তাহলে নামাজ সংক্ষিপ্ত করতেন। বাচ্চা কাঁদলে বাচ্চার মায়েরও কষ্ট হয়। তাদের দুজনের কথা চিন্তা করে কুরবান করে দিতেন নিজের শাস্তি। বাচ্চাদের প্রতি এমনই দরদি ছিলেন আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ ﷺ।

নবিজিকে ঘিরে থাকা শিশু-কিশোররা

চলুন, এবার নবিজির আশেপাশে থাকা কিছু শিশু-কিশোরদের সঙ্গে পরিচিত হই।

প্রথমেই বলি আনাসের কথা। আনাস বিন মালিক ১০ বছর বয়স থেকে নবিজির সেবা শুরু করেন। ২০ বছর বয়স পর্যন্ত নিরবধি তাঁর ছায়াসঙ্গী ছিলেন। ‘আনাস’ মানে সুখ; খুব সুন্দর ছোট্ট একটি নাম। নবিজি তাকে আদর করে ডাকতেন ‘উনাইস’; ছোট্ট আনাস। ঘরে কী ঘরের বাইরে, নবিজির অনেক কিছুই তিনি নিজের চোখে দেখতেন। এ জন্য তাঁর কাছে এ সম্বন্ধে আমরা অনেক বর্ণনা পাই। তাঁর জন্ম ও বসবাস মদিনায়। তাই নবিজির মাক্কি জীবন সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে কিছুই শোনা যায় না।

হাসান ও হুসাইন- নবিজির সবচেয়ে প্রিয় দুই নাতি। হাসানের জন্ম হয় মদিনায় হিজরত করার তিন বছর আগে। এর এক বছর পরেই জন্ম হয় হুসাইনের।

হাসান-হুসাইনের বাবা-মা আলি ও ফাতিমার বিয়ে হয়েছিল অল্প বয়সে। অল্প বয়সে বিয়ে করাকে ঠিক কবে থেকে আমাদের দেশে ‘পাপ’ বলে গণ্য করা হয় তা জানি না। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস, এমনকী বাংলাদেশে আজ থেকে ৫০ বছর আগেও বিষয়টি ছিল খুব স্বাভাবিক। অল্প বয়সে বিয়ে করলে মেয়েদের পড়াশোনার সুযোগ কমে, সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মায়ের মৃত্যুর শঙ্কা বাড়ে- এ রকম কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার জের টেনে পবিত্র বন্ধনের বিষয়টাকে কেন ‘অপরাধ’ হিসেবে রূপান্তরিত করা হলো, তা ভেবে দেখা উচিত।

যাই হোক, বলছিলাম আলি-ফাতিমা (রা.)-এর বিয়ের কথা। জীবনের একেবারে শুরুতেই তারা দুজন গাঁট বেঁধেছিলেন। জীবনের সব সুখ-দুঃখ- সমানভাবে ভাগাভাগি করে নিতেন। হয়ে উঠেছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। এমন এক নির্মল পরিবারে জন্ম দুই ফুটফুটে সন্তান- হাসান আর হুসাইনের। খোদ নবিজি তাদের নাম রেখেছিলেন। হাসানের জন্মের সময় নবীজির বয়স ছিল ৫৬। নাতিদের সঙ্গে নবিজির খেলা করার ঘটনাগুলো দেখার সময় বয়সের ব্যবধানটা খেয়াল রাখতে হবে, তাহলে নতুন কিছু খোরাক পাওয়া যাবে।

হাসানের চেহারা ছিল অনেকটা নবিজির মতো। আবু বকর সিদ্দিক একদিন কথাটা আলি (রা.)-এর কাছে তুলেছিলেন। একজন বাবা হিসেবে তখন তাঁর বুক আনন্দে-গর্বে কতটা ভরে উঠেছিল, ভাবা যায়! হাসান-হুসাইনের জন্য দুআ করে নবিজি আল্লাহর কাছে বলেছিলেন-

‘আল্লাহ, আমি তাদের ভালোবাসি। আপনিও তাদের ভালোবাসুন।’ বুখারি

নবিজির এমন দুআর ভাগীদার যদি হতে পারতাম!

আরেকজন কিশোর সাহাবি ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.)। জগদখ্যাত খলিফা উমর বিন খাত্তাবের মদিনা হিজরতের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর। ৬৩২ সালে নবিজির ওফাতের সময় তিনি ২০ বছরের টগবগে তরুণ। মাত্র ১০টি বছর নবিজির সান্নিধ্যে থেকে নিজেকে অন্যতম ধার্মিক ব্যক্তিতে পরিণত করেছিলেন তিনি। আজকে ২০ বছরের কোনো তরুণকে ধার্মিক হতে দেখলে সমাজ সন্দেহের চোখে দেখে। ভাবে, বুঝি জঙ্গি হয়ে যাচ্ছে। অনেক কট্টকথা শুনতে হয়। এই বয়সেই দাড়ি-টুপি কেন, কোনো দল করে কি না ইত্যাদি; অথচ নবিজির আশপাশ কিশোর-তরুণ সাহাবিতে ছিল ভরপুর।

এমন আরেকজন কিশোর সাহাবি ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)। নবিজির মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৩। অন্য কিশোর সাহাবিদের মতো নবিজির সান্নিধ্যে বেশি দিন কাটাতে পারেননি তিনি; তিন বছরেরও কম সময় পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর বাবা আব্বাস ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন

মক্কা বিজয়ের পর। কিন্তু এই অল্প সময়েই নবিজির সঙ্গে থেকে থেকে যতটা পেরেছেন, শাণিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। তাঁর জন্য বিশেষ দুআও করেছিলেন নবিজি—

‘আল্লাহ, তাকে জ্ঞান শেখান। কুরআনের ব্যাখ্যা শেখান।’ ইবনে মাজাহ

চাচাতো ভাই মুহাম্মাদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে, খেলাধুলা করে, আলাপে-অবসরে কুড়িয়ে নিয়েছেন মূল্যবান সব জ্ঞান।

গতানুগতিক চোখে চিরাচরিতভাবে আমরা দেখে এসেছি, নবিজি সময় কাটাচ্ছেন ভবিষ্যৎ-খলিফা আবু বকর, উমর, উসমান, আলিদের সঙ্গে। কিন্তু আমাদের শিশুকেন্দ্রিক চশমায় দেখতে পাচ্ছি— আনাস, হাসান, আব্দুল্লাহর মতো বেশ কয়েকজন কিশোর-তরুণ সাহাবির সাথে তাঁর সংস্পর্শে ধন্য করেছেন নিজেদের।